ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়
সাধন কুমার দাস

২৩ মার্চ ২০১০

সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

এম. হাফিজ উদ্দিন খান
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়, *ফেলো- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
সাধন কুমার দাস, *ফেলো- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহায়তায়

কে. এম. শরিফ-উর-রহমান, সুলতান আহমেদ, মো. আব্দুল মতিন, মো. নূর ইকবাল তালুকদার

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি নং ১৪১, সড়ক নং ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: dipu@ti-bangladesh.org, shadhan@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো টেলিফোন। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও দেশের অর্থনীতিতে পূর্বতন বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি), বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিকম্যুনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এটি সরকারের একটি লাভজনক খাত এবং উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের অবদান ছিল ৮,৪৮৫ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিটিটিবি'র রাজস্ব আদায় হয় ১,৫৬৫ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি মালিকানাধীন এই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এককভাবে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে নেতৃত্ব দিলেও বর্তমানে বেসরকারি ল্যান্ড ও মোবাইল কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে।

সরকারি মালিকানাধীন টেলিফোন সেবা সম্পূর্ণ লাভজনক হলেও এর সেবার মান নিয়ে জনমনে অসন্তুষ্টি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যম, দুর্নীতি দমন কমিশন, টাস্কফোর্স ও সিআইডি প্রতিবেদনে এবং সভা-সেমিনারে এর বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, কর্মীদের অদক্ষতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। তবে ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও কোনো অনুসন্ধানী গবেষণা পরিচালিত হয়নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি করে আসছে। একই লক্ষ্যে টিআইবি ২০০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি টেলিফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তৎকালীন 'বিটিটিবি'র ওপরে গবেষণা শুরু করে। গবেষণা চলাকালীন এটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করায় কোম্পানি হিসেবে এর মৌলিক চ্যালেঞ্জসমূহও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৮৫৩ সালে ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে টেলিগ্রাফ শাখা কার্যক্রম শুরু করে এবং বিভিন্ন সময়ে পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৭৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই টেলিযোগাযোগ খাত দ্য টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৮৮৫ (অ্যাক্ট নং XIII of 1885), দ্য ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট, ১৯৩৩ (অ্যাক্ট নং XVII OF 1933), ন্যাশনাল টেলিকম্যুনিকেশন্স পলিসি, ১৯৯৮ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে ১ জুন ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারি করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১ জুলাই ২০০৮ তারিখ থেকে বিটিটিবিকে বাংলাদেশ টেলিকম্যুনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) নামক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। বিটিটিবি'র সকল সম্পদকে ১৫,০০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন ধরে বিটিসিএল যাত্রা শুরু করে। বিটিটিবিতে কর্মরত ১,১৭০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১২,৬৩৬ জনকে ১২,৬৩৬টি সুপারনিউমারি পদ সৃষ্টি করে সকলের চাকরি দুই বছরের জন্য নিশ্চিত করা হয়। পূর্বে একজন চেয়ারম্যান, চার জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং তিন জন খণ্ডকালীন সদস্য দ্বারা বিটিটিবি পরিচালিত হলেও বর্তমানে নয় জন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা বিটিসিএল পরিচালিত হচ্ছে। এর সমস্ত কার্যক্রম চারটি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়: রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থ এবং প্রশাসনিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

১.১ *গবেষণার উদ্দেশ্য:*

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়া এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো সরকারি মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এর সেবা নিতে গিয়ে গ্রাহকরা যে হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন ও মাত্রা উদঘাটন করা; এবং বিটিসিএল-এ বিরাজমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ দেওয়া।

১.২ *গবেষণা পদ্ধতি:*

গবেষণায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে গুণবাচক ও পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিআইডি, টাস্কফোর্স ও দুদক-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এবং ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে গ্রাহক জরিপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ। সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতির মাত্রা যাচাই করার জন্য জরিপে মোট ৫১০ জন বিটিটিবি'র টেলিফোন গ্রাহককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। গ্রাহক জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে ২০০৮ সালের ৭ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

সরকারি টেলিযোগাযোগ খাতে কার্যকর গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটিটিবি থেকে বিটিসিএল'এ রূপান্তরিত করা হলেও বর্তমান বিটিসিএল এ নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

২.১ বোর্ডের ওপর মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা

বিটিটিবি থাকাকালীন ১৯৭৯ এর অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া বোর্ডের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। ফলে প্রকল্প গ্রহণ, পরিচালনা, বাস্তবায়ন, কল রেট কমানো-বাড়ানো, বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ, সেবার বিস্তার, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারক বা কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিয়ে বোর্ডকে সর্বদা কাজ করতে হতো। বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্ধারিত হতো। অনেকক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্পে যে পরিমাণ বাজেট প্রয়োজন তা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হতো না। ফলে সেবা বিস্তারে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিতো। এখনও বিটিসএল -এ রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ পাচ্ছেন এবং প্রকল্প অনুমোদনে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ রয়েছে।

২.২ প্রধান নির্বাহীর স্বল্প মেয়াদ

জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়ায় চেয়ারম্যান এক-দুই বছরের বেশি কর্ম-সময় পেতেন না। এই স্বল্প সময়ে তার পক্ষে নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হতো না। ১৯৭৯ সাল থেকে জুন ২০০৮ এই ৩০ বছরে ১৯ জন চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পান। বিটিসিএল হওয়ার পর মাত্র দেড় বছরেই দুই জন এমডি নিয়োগ পেয়েছেন।

২.৩ প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব

ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ হওয়ার ফলে টেলিপ্রিন্টার, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল অপারেটর, টেকনিশিয়ান ও টেলিকম মেকানিক পদাধিকারীদের বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ নেই। অথচ কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন জনবল যেমন, প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর প্রয়োজন থাকলেও সেসব পদে নিয়োগ হচ্ছে না। বর্তমানে প্রকৌশলী পদের প্রায় ৩২% খালি।

নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ না হওয়ায় অর্থ বিভাগ ও আইটি ডিভিশনে নতুন লোক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থ বিভাগে গ্রাহকদের ডেটাবেজ, আধুনিক অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া, উন্নত বিলিং ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য স্বয়ংক্রিয় (অটোমেশন) পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। আর অটোমেশন পদ্ধতি চালু না করায় বিলিং, বিল উত্তোলন, অন্যান্য হিসাবসহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই বিটিটিবি'র সময় প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতি বর্তমানেও চালু রয়েছে।

২.৪ পুরোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সক্ষমতার অভাব ও রাজস্ব বকেয়া

বিভিন্ন দেশে টেলিফোন খাতে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলেও বিটিসিএল তার প্রযুক্তি হালনাগাদ করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। প্রায় ১৭ বছর আগে বসানো স্পেয়ার কার্ড দ্বারা বিটিটিবি তার কার্যক্রম চালিয়েছে যার প্রকৃত মেয়াদ ছিলো ১০ বছর। এখনও এ অবস্থার উন্নতি হয় নি। ব্যবহৃত সংযোগ, বিলিং ও সংযোগ-পরবর্তী সেবা দেওয়ার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে গ্রাহক সেবার ওপর।

বিটিটিবি থাকা অবস্থায় চাহিদার তুলনায় সংযোগের সক্ষমতা কম ছিল, ফলে সংযোগ দেওয়া বা স্থানান্তরে অনেক বেশি সময় লাগতো। সংযোগ দেওয়া, স্থানান্তর, বিলিং সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য সেবার জন্য বিটিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ ও বকশিস দিতে হতো। বিটিসিএল-এ এখন ঢাকার বাইরের সংযোগ পেতে পূর্বের তুলনায় কিছুটা সময় কম লাগলেও ঢাকায় সক্ষমতা কম হওয়ায় এখনও সংযোগ পেতে অনেক সময় লাগে এবং এর জন্য বকশিস দিতে হয়। টেলিফোন লক না করলে এখনও গ্রাহকের অজান্তে অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে নতুন প্রযুক্তি কার্যকর না হওয়ায় এর চেয়ে ভাল সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না।

আন্তর্জাতিক কলের বিলিং-এর ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত না হওয়ায় বিটিটিবি'র বিলের পরিমাণ এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার কোম্পানির বিলিং-এ পার্থক্য দেখা যেতো। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ এবং সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত বিল আদায় করা সম্ভব হতো না এবং বড় অংকের অর্থ বকেয়া থেকে যেতো। বর্তমানে বিটিসিএল এ অটোমেশনের অভাবে একই সমস্যা বিদ্যমান। ফলে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত ৬৮৭.০৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু ব্যাংকগুলো বিল গ্রহণের জন্য সার্ভিস চার্জ দাবি করায় বিটিসিএল-এ বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৫ কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অনুপস্থিতি, প্রচারণার অভাব ও নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা

টেলিফোন লাইনের সমস্যা সমাধানের জন্য ক্যাম্প অফিস থাকলেও কোনো কাস্টমার কেয়ার সেন্টার নেই। এই ক্যাম্প থেকে যেকোনো সেবা নেওয়ার জন্য বকশিস দিতে হয়। তাছাড়া অফিস সময়ের পরে ও ছুটির দিনে এই ক্যাম্প অফিস বন্ধ থাকতো। তবে বর্তমানে এই ক্যাম্প অফিস রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা রাখার আদেশ হয়েছে।

সেবার ধরন, বিভিন্ন সেবার জন্য ফি'র পরিমাণ এবং সেবা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিটিটিবি'র কোনো প্রচারণা ছিলো না। বর্তমানে প্রচারণার জন্য বিটিসিএল'এর বাজেট মাত্র দশ লক্ষ টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

বিটিটিবি প্রণীত নাগরিক সনদে উল্লিখিত কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হতো না। সনদ প্রণয়নে সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণ ছিলো না। এছাড়া সনদে বিভিন্ন সেবা প্রদানে ফি'র পরিমাণ ও সনদ প্রণয়নের তারিখ উল্লেখ ছিলো না। একই নাগরিক সনদ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বিটিসিএল'র ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

২.৬ কেবল কাটা ও চুরি

মাটির নিচের সংযোগ কেবল মাঝে মাঝে ওয়াসা, ডেসা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে রাস্তা খোঁড়ার সময় কাটা পড়ে এবং নষ্ট হয়। এছাড়া বিটিটিবি'র তার ঘন ঘন চুরি হয়। ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৮৬৮টি তার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমানেও কেবল চুরি হওয়া বা কাটা পড়ার কারণে গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সমস্যা রয়ে গেছে। তবে বিটিসিএল হওয়ার পরে ঢাকার চারটি এলাকায় অপটিকাল ফাইবার স্থাপন করেছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

২.৭ অবৈধ ভিওআইপি

অবৈধ ভিওআইপি চালু থাকার কারণে বিটিটিবি প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব হারিয়েছে। এই অবৈধ ভিওআইপির সাথে দেশের মোবাইল কোম্পানি, পিএসটিএন অপারেটর এবং আইএসপিদের সংশ্লিষ্টতা আছে এবং এদের নিকট থেকে বিটিআরসি অবৈধ ভিওআইপি'র জন্য জরিমানা হিসাবে ২০০৮ সালে মোট ৮৬১.১৬ কোটি টাকা আদায় করেছে। এক্ষেত্রে বিটিটিবি'র কিছু কর্মকর্তা, কর্মচারী ও লাইনম্যান জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। বিটিআরসি'র কর্মকর্তাদের মতে অবৈধ ভিওআইপি কখনই পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ বিটিআরসির পক্ষে ভি-স্যাট ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে আইআইজি, আইজিডব্লিউ, আইএক্সএন, মোবাইল কোম্পানি, পিএসটিএনগুলো নিজেই অবৈধ ভিওআইপি'র সাথে যুক্ত কিনা তা পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে প্রযুক্তি দরকার তা বিটিআরসি'র নেই। অনেকক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে একটি প্রযুক্তি বন্ধ বা ব্লক করে দিলেও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি অব্যাহত থাকে যা বিটিআরসি'র পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

৩. অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১ রাজনৈতিক বিবেচনায় পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতি

গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলির জন্য আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ পন্থায় পদোন্নতি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক দুর্নীতি করার প্রবণতা থাকে।

৩.২ পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাব

সরকারি নিয়োগ নীতিমালা এবং বিটিটিবি'র নিজস্ব ম্যানুয়াল অনুসারে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক পরিচয়, স্বজনপ্রীতি, সিবিএ'র প্রভাব, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনো উদাহরণ না থাকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের যথাযথ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন না হওয়ায় কখনই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়নি।

বিটিটিবিতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো শাস্তি দেওয়ার উদাহরণ ছিলো না, এখনও তা দেখা যাচ্ছে না। তবে বর্তমানে পরিচালনা পর্ষদ ভালো কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পুরস্কার দিচ্ছে।

৩.৩ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় অনিয়ম

দেশের ভেতরে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য থাকা-খাওয়া ও ভ্রমণ ভাতার পরিমাণ কম হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্রহ কম থাকতো। এছাড়া প্রশিক্ষণের সময়সূচি, সিলেবাস হালনাগাদ করা, নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হতো না। অথচ বিদেশে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন করায় প্রকল্পের সাথে জড়িত টেকনিক্যাল ও নিয়মিত প্রশিক্ষণগুলোতেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব ও তাদের ব্যক্তিগত সচিব ও সহকারী ব্যক্তিগত সচিবদের পাঠানো হতো। মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকায় কিছু কর্মকর্তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে একাধিকবার বিদেশে প্রশিক্ষণ বা ভ্রমণের সুযোগ পেতো।

বিটিসিএল-এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আগের কিছু সমস্যা থাকলেও বর্তমানে বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই এবং এজন্য সরকারি আদেশ সংগ্রহ বিটিসিএল নিজেই করে।

৩.৪ সিবিএ নেতাদের দুর্নীতি

শ্রম আইন অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকার নিয়ম থাকলেও বিটিটিবিতে পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। এর মধ্যে সরকার সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানকে বা কন্ট্রাক্টরকে কাজ পাইয়ে দিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতো, লাইনে ত্রুটি সৃষ্টি করে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতো, অবৈধ টেলিফোন সংযোগ

দিতো, ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করতো, গাড়ি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, তেলের খরচের জন্য ভুয়া ভাউচার দেখাতো এবং ওয়ার্কশপের সাথে যোগসাজস করে অর্থ আত্মসাৎ করতো, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করতো এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অপমান ও অপদস্ত করতো।

বর্তমানে বিটিসিএল-এ পূর্বের ন্যায় পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট। সিবিএ নির্বাচন না হলেও সরকার সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়নই বেশি আধিপত্য বিস্তার করছে। বিটিসিএল হওয়ার পর ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণে অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাতের সুযোগ কমে যাওয়ায় সিবিএ বা ট্রেড ইউনিয়নের দুর্নীতির সুযোগও কমে গেছে।

৩.৫ পরিবহন শাখায় দুর্নীতি

পরিবহন শাখার অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানি ক্রয়ের নামে অর্থ আত্মসাৎ করতো। প্রধান কার্যালয়ে ২৭টি গাড়ি ব্যবহারের অনুমোদন থাকলেও ব্যবহার হচ্ছিল ১০৪টি গাড়ি। এই সকল গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ ২০০০-০১ থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট ৩০.৩৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয় যা গাড়ি প্রতি বছরে গড়ে ৫.৪১ কোটি টাকা। অন্যদিকে গাড়ির জ্বালানির জন্য তেল না নিয়েও তেল ডিপোর সাথে আঁতাত করে ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। ২০০০-০১ থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের জন্য ১৩ কোটি ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৯ টাকা খরচ করা হয়, যার বাৎসরিক গড় ব্যয় ছিল ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৩৩ টাকা।

বিটিটিবি থাকাকালীন একটি গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি কাজের জন্য চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা এবং একজন বিভাগীয় প্রকৌশলী সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা খরচ করতে পারতো। কিন্তু বিটিসিএল এ এই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভাগীয় প্রকৌশলীরা প্রতি কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা এবং এমডি সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও বিটিসিএল এর গাড়ি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে মন্ত্রণালয় বিটিসিএল এর ৯টি গাড়ি ব্যবহার করছে। এর মধ্যে মন্ত্রী ব্যবহার করছে ২টি গাড়ি। পূর্বে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ গড়ে খরচ হতো প্রায় ৫.৪১ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ গড়ে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে খাতওয়ারি একটি কার্ড পূরণ করতে হয়। ফলে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও তেল খরচ বাবদ অবৈধ ব্যয় কমে গেছে।

৩.৬ প্রকল্পে দুর্নীতি

বিটিটিবি'র দুর্নীতির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ছিলো বিভিন্ন প্রকল্প। বড় বাজেটের প্রকল্পগুলোতে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইএমইডিসহ সকল সংস্থার সংশ্লিষ্ট কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকতো। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রথমে বিটিটিবি'র পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী বা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বা বিভাগীয় প্রকৌশলী প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করতো। এই প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। অনেকক্ষেত্রে দেশের স্বার্থে দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এমন প্রকল্প মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় বাজেট স্বল্পতা বা উচ্চাভিলাষী প্রকল্প উল্লেখ করে স্থগিত বা বাতিল করা হতো। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো কাজ পাওয়ার জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ করতো যারা ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে লবিং এবং ঘুষের পরিমাণ নিয়ে দর কষাকষি করতো। দরপত্র সম্পর্কিত সমস্ত কাজ যেমন প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি, আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ, বিজ্ঞাপন দেওয়া, দরপত্র জমাসহ নিয়ম মাফিকভাবে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ দেওয়ার পরও মন্ত্রী বা সচিবের নিকট থেকে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানিকে কাজ দেওয়ার সুপারিশ আসতো এবং তা কার্যকর করা হতো। কোম্পানির নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নে নিরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালক তাদের দায়িত্ব পালনে বিরত থাকায় মানসম্মত কাজ হতো না।

বিটিসিএল হওয়ার পর প্রকল্প গ্রহণ ও তা প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে, তারপরও কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। বিটিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে পাঁচটি এবং সরকারি ও বৈদেশিক অর্থায়নে ছয়টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় যা এখনও পরিকল্পনা বা টেন্ডারিং পর্যায়ে রয়েছে।

৩.৭ নিরীক্ষায় দুর্নীতি

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের প্রয়োজনমতো কাগজপত্র তৈরি করে নিরীক্ষা করার কারণে এর মাধ্যমে বিটিটিবি'র সঠিক চিত্র উঠে আসতো না। অন্যদিকে সিএজি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিবছর একই ধরনের সাধারণ কিছু অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হতো। এক্ষেত্রে ঘুষ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে প্রকৃত চিত্র ধামাচাপা দেওয়া হতো। ২০০০-০১ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পরিবহন পুলের জ্বালানি ও মেরামত এবং রাজস্ব বিভাগের অবৈধ বিল ও ভাউচার বাবদ অর্থ আত্মসাৎ সম্পর্কে কোনো পর্যবেক্ষণ নেই। অথচ দুদক, সিআইডি ও টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে এ খাতে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র উঠে এসেছে।

৩.৮ ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ

সরকারি নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও রাজস্ব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতিদিন এক অফিস থেকে অন্য অফিসে যাতায়াত বাবদ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিল-ভাউচরের মাধ্যমে অবৈধভাবে যাতায়াত ভাতা গ্রহণ করে। এভাবে ঢাকার ৪টি রাজস্ব অফিসের কর্মচারীরা ২০০০-০১ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত অবৈধভাবে যাতায়াত ভাতা বাবদ মোট ৬.৭২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে।

৩.৯ অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়

প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও সুইচ রুম ও মেইন ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেম (এমডিএফ) রুমের ধুলোবালি পরিষ্কার, টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওভারহেড কেবল ড্রপওয়ার মেরামত, রেলওয়ে ট্রাংক লাইন মেরামত, এয়ারকুলার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের বেতন-ভাতা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা আত্মসাৎ করতো। ২০০০-০১ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ৭.০৬ কোটি টাকার অবৈধ শ্রমিক, কুলি ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। টেলিফোন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য প্রচুর ড্রপওয়্যার, তার, ডিপি বক্স ও কেবিনেট বাক্স ক্রয় বাবদ প্রতি বছরই বাজেটের অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে পরবর্তী বছরে তা তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করা হতো। ২০০০-০১ থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বমোট বাজেটের অতিরিক্ত ৬৬.৯৮ কোটি টাকা অবৈধভাবে ব্যয় করা হয়।

৪. টেলিফোন গ্রাহক সেবায় সমস্যা ও অনিয়ম

দেশব্যাপী স্থাপনা, বিস্তৃত নেওয়ার্ক, পর্যাপ্ত জনবল ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও টেলিফোন সেবায় নানা সমস্যা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় বিটিটিবি গ্রাহক জরিপে।

৪.১ সংযোগ নিতে হয়রানি

অধিকাংশ গ্রাহক (৬০%) টেলিফোন সংযোগ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি নিজেই করেছে। অন্যান্যরা বিটিটিবি'র কর্মকর্তা, পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়, প্রতিবেশি এবং দালালের সাহায্যে সংযোগ নিয়েছে। ৩৫% গ্রাহক গত ৫ বছরের মধ্যে সংযোগ নিয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে দাবিনামা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও ১৯% গ্রাহকের দাবিনামা পেতে ১ মাস সময় লেগেছে। তবে ৬% গ্রাহক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার দিনই দাবিনামা পেয়েছিল। যারা সাত দিনের মধ্যেও দাবিনামা পাননি তাদের মধ্যে ৪৪% গ্রাহক মনে করেন অফিসিয়াল সিস্টেমের জটিলতার কারণে তারা তা পাননি। অন্যান্য কারণের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গাফিলতি, কাগজপত্র ঠিক না থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ৪৯% গ্রাহক দাবিনামার টাকা জমা দেওয়ার ১ মাস বা তার কম সময়ের মধ্যে সংযোগ পেয়েছে তবে ১৩% গ্রাহক ২ মাস, ১১% গ্রাহক ৩ মাস এবং অন্যান্যদের ৩ মাসের অধিক সময় লেগেছে। যারা সাত দিনের মধ্যে সংযোগ পায়নি তাদের মধ্যে ৩৩% গ্রাহককে কারণ হিসেবে সংযোগ তার না থাকা, ১৬% গ্রাহককে নম্বর না থাকা এবং অন্যান্যদেরকে কয়েল না থাকা, কাগজপত্র প্রস্তুতে সময় লাগা ইত্যাদি জানানো হয়েছে। এছাড়া সংযোগ পেতে ৬৬% গ্রাহককে গড়ে প্রায় ৬,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ১৮% গ্রাহক চুক্তির মাধ্যমে সংযোগ নিয়েছে। দ্রুত টেলিফোন সংযোগ পাবার জন্য ২৮% গ্রাহক লাইনম্যানকে ঘুষ দিয়েছে। ২১% গ্রাহক বলেছে লাইনম্যানের পরে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে কেরানিকে।

৪.২ বিল নিয়ে হয়রানি

জরিপে ৭৪% গ্রাহক বিল নিয়ে হয়রানির অভিযোগ করেছে। এই হার ঢাকায় ৮১%, উপজেলা পর্যায়ে ৬২% এবং জেলা পর্যায়ে ৫৫%। এক্ষেত্রে ৪৯% গ্রাহক অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক বিলের অভিযোগ করেছে। এছাড়া ২০% গ্রাহক বিল জমা দেওয়া সত্ত্বেও লাইন কেটে দেওয়া, ১৪% ক্ষেত্রে বিল বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, ৯% গ্রাহক বিল জমা দেওয়া সত্ত্বেও বিল না দেওয়ার নোটিশ পাওয়া এবং ৫% গ্রাহক টেলিফোন বিল জমা দেওয়া সত্ত্বেও পুনরায় একই বিল আসার কথা উল্লেখ করে। এসব সমস্যা সমাধানে গ্রাহকদের ন্যূনতম ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ বা বকশিস দিতে হয়েছে, যার বেশিরভাগই দিতে হয়েছে লাইনম্যানকে।

৪.৩ টেলিফোন সংযোগ স্থানান্তর ও অন্যান্য সমস্যা

টেলিফোন স্থানান্তরে একটি নির্দিষ্ট ফি দেওয়ার নিয়ম থাকলেও সংযোগ স্থানান্তরকারীদের মধ্যে ৭১% গ্রাহককে গড়ে ২,০৫০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ৬৪% গ্রাহক ঘুষ দিয়েছে লাইনম্যানকে এবং স্থানান্তরে গড়ে ৩৬ দিন সময় লেগেছে। এছাড়া প্রায় সকল গ্রাহক (৯৫%) তাদের টেলিফোনে অবাঞ্ছিত শব্দ, ক্রস কানেকশন, তার চুরি, টেলিফোনে কলার আইডি সুবিধা নিতে সমস্যা প্রভৃতি উল্লেখ করে।

৪.৪ স্টাফদের আচরণ এবং কোম্পানিতে রূপান্তর সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত

জরিপের তথ্যানুযায়ী ৩৮% গ্রাহক গত এক বছরের টেলিফোন সেবায় সন্তুষ্ট। কিন্তু এই সময়ের আগের এক বছরের টেলিফোন সেবায় ৪৯% গ্রাহক অসন্তুষ্ট। ২৬% গ্রাহক স্টাফদের আচরণ সম্পর্কে কাজে গাফিলতি, কাজে ফাঁকি দেওয়া, দায়িত্বে অবহেলা, অভিযোগ করলে গুরুত্ব না দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ করে। ৭৬% গ্রাহক বিটিটিবিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করায় ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে।

৫. বিটিসিএল-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

বিটিসিএল সৃষ্টির পর উন্নত গ্রাহকসেবার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে কল রেট কমানো, সংযোগের আবেদন পত্র পরিবর্তন, ক্যাম্প অফিস রাত ৯টা পর্যন্ত এবং ছুটির দিনে খোলা রাখা, সংযোগ প্রদানের সুযোগ না থাকলে দাবিনামা প্রদান বন্ধ রাখা, লাইন রেন্টের সমপরিমাণ কলিং চার্জ ফ্রি, প্রি-পেইড কলিং কার্ড চালু, টোল ফ্রি ফোন চালু, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংযোগ ফ্রি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্যোগ নেওয়ার পরও বিটিসিএলকে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে:

- বিটিসিএলকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার ও আইনি কাঠামোর পরিবর্তন, বিদ্যমান সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিপনন কৌশল ও শেয়ার অফলোড সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়নি।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও যুগ্ম সচিব পর্যায়ের চারজন এবং সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা পদাধিকারবলে বিটিসিএল পরিচালনা বোর্ডের সদস্য। অর্থাৎ কোম্পানিতে রূপান্তরের পরও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের মতোই মন্ত্রণালয়ের এবং সরকারি কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। এছাড়াও বিটিসিএল'র সম্পূর্ণ শেয়ার সরকারের হাতে থাকায় এর জবাবদিহিতাতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আবার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের প্রশাসনিক কাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও টেলিকম বিষয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে।
- বিটিটিবি'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকা, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, সেবাদানের মানসিকতার অভাব, সময়নিষ্ঠতার অভাব ইত্যাদি দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। এ প্রেক্ষিতে বিটিটিবি'র সকল কর্মীকে যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিটিসিএল-এ আত্মীকরণের ফলে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির গুণগত কোনো পরিবর্তন হয়নি।
- বিটিসিএল সৃষ্টির দুই বছর পরে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিসিএস ক্যাডার অফিসাররা কোম্পানিতে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা বা বেতন-ভাতা পাবে অথবা কোম্পানিতে কাজ করতে আগ্রহী না হলে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া কী হবে তার কোনো নির্দেশনা বিটিসিএল-এ দেওয়া হয়নি। ফলে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে।
- বিটিটিবি'র সম্পদের মূল্য প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে অনেক মুখ্য তথ্যদাতা জানান। কিন্তু ডাটাকন বিটিটিবি'র সম্পদের যে হিসাব করেছে তার পরিমাণ মাত্র ১৫ হাজার কোটি টাকা। সারাদেশে বিটিসিএল'র জমি রয়েছে ১৮৪৩.২৯ একর, এর মধ্যে ঢাকাতেই রয়েছে ১৯৬.১৯ একর। সম্প্রতি হোদাভাসি নামক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস ফার্ম বিটিসিএল-এর সম্পদের মূল্যায়ন করে মোট সম্পদের মূল্য দেখিয়েছে প্রায় আটত্রিশ হাজার কোটি টাকা।
- বিটিসিএল-এ নতুন প্রযুক্তি সংযোজনের জন্য যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো বেশিরভাগই পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। ফলে এর সংযোগ ফি, কল ফিসহ অন্যান্য ফি কমানো হলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। জুন ২০০৬ সময়ে বিটিটিবি'র সংযোগ সংখ্যা ছিল ৮,৮৯,১৭৪টি, যা এক বছর পর জুন ২০০৭ এ কমে দাঁড়ায় ৮,৭৭,৫২২টি। এই সংযোগ সংখ্যা জুন ২০০৮ এ আরও কমে দাঁড়ায় ৮,৩৬,১৪৭টি। বিটিসিএল হওয়ার পরে এক বছরে মাত্র ৩০,৬৫১টি সংযোগ বৃদ্ধি পায়। তবে জুলাই ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৯ সময়ে জেলা উপজেলা শহরে টেলিফোন সংযোগ ফ্রি করার কারণে মোট সংযোগ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৪১,৩৬৯টি।
- বিটিটিবিতে যেসকল প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ছিল বিটিসিএল-এ সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া অধিকাংশই বিদ্যমান, যেমন- সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, এমডি নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা, পুরোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার, তার কাটা বা চুরি হওয়া, সেবা সংশ্লিষ্ট প্রচারণার অভাব, কাস্টমার কেয়ার ডেস্ক না থাকা, অবৈধ ভিওআইপির প্রচলন, নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি। ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা এখনও বিরাজমান তবে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুমোদনে কিছুটা সময় কম লাগে। বিটিসিএল-এর নিজস্ব ক্রয়নীতি না থাকায় এখনও পিপিআর মেনে চলা হচ্ছে।

৬. সুপারিশ:

ক. কাঠামোগত সংস্কার

১. টেলিযোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসনে সফল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিটিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদ গঠন করতে হবে।

২. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে এর পরিচালনা বোর্ডের ওপরে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ থাকতে পারবে না, আয় ব্যয়ের ক্ষমতাসহ পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের থাকতে হবে, বোর্ডের সদস্যদের হতে হবে পক্ষপাতহীন এবং কোম্পানির শেয়ার স্টক মার্কেটে ছাড়তে হবে।

৩. বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা এবং কমপক্ষে দুই বছর মেয়াদকাল নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. যত দ্রুত সম্ভব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে।

৫. নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। পুরোনো কিন্তু দক্ষতার অভাব রয়েছে এমন জনবলকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।
৬. বিটিসিএল-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা যেতে পারে, যে কমিটি দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির সুপারিশ করবে।
৭. সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ভিওআইপি'র উন্মুক্তকরণ দ্রুত কার্যকর করতে হবে।
৮. পিপিআর-এর আলোকে বিটিসিএল-এর নিজস্ব ক্রয় নীতি প্রণয়ন করতে তা অনুমোদন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৯. সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার ওপরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, অভিজ্ঞতা ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রভাবমুক্ত থেকে তা কার্যকর করতে হবে।
১১. প্রতিবছর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবৈধ সম্পদ বা দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি একটি 'গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার মাধ্যমে বাজার যাচাই করে বিটিসিএল-এর সেবা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।
১৩. বিটিসিএল-এর হিসাব বেসরকারি প্রথম শ্রেণীর অডিট ফার্ম দিয়ে নিরীক্ষা করার পরে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পাওয়া যাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
১৪. বিটিটিবি'র সম্পত্তির প্রকৃত পরিমাণ সুষ্ঠুভাবে পুনর্মূল্যায়ন করে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।
১৫. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে।
১৬. নিয়মানুযায়ী তিনটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন যেন না থাকে সেজন্য শ্রম মন্ত্রণালয়কে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক দলের নামে যাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো অনুমোদন না পায় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে সুপারিশ

১৭. দাবিনামা প্রাপ্তি, সংযোগ ও টেলিফোন স্থানান্তর সেবা বিনামূল্যে দিতে হবে।
১৮. টেলিফোন সংযোগ সর্বদা চালু রাখার জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করতে হবে। বকেয়া বিলের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৯. আধুনিক বিলিং ব্যবস্থা যেমন, আইটেমাইজড বিল চালু করতে হবে। সকল স্থানে প্রিপ্রেইড কার্ডের মাধ্যমে বিল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিল সংক্রান্ত গ্রাহক হয়রানি কমাতে সব এলাকায় ওয়ান স্টপ ও অনলাইন সেবা চালু করতে হবে।
২০. বিটিসিএল প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে ও বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় প্যাকেজ দিতে হবে।
২১. কাস্টমার কেয়ার ও হেল্প ডেস্ক চালু করতে হবে।
২২. বিটিসিএল-এর ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয় ও হালনাগাদ করতে হবে। গ্রাহকদের জন্য এখানে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যের ডাটাবেজ থাকতে হবে। অকার্যকর লিংককে কার্যকর করতে হবে।
২৩. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে নাগরিক সনদটিকে পুনঃপ্রণয়ন করে সেখানে সেবা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা হালনাগাদ করতে হবে।